বিপ্লবী শ্রেণীর সন্ধানে

মুস্তফা হুসাইন

গত শতাব্দী থেকে ঘটে যাওয়া বিপ্লবের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, বিপ্লবী শ্রেণীটা সমাজের মূলধারার মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিলের জন্য এ শ্রেণীটি এত বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে যে, সর্বস্তরের মানুষ তাদের এই ত্যাগকে এক পর্যায়ে সমর্থন দিতে শুরু করে। বিপ্লবী আন্দোলনের সফলতা ও আকর্ষণের প্রধাণ কারণ ছিল বিপ্লবীদের নিজ আদর্শের উপর অবিচলতা ও আত্মত্যাগ। অবিচলতা ও আত্মত্যাগই প্রাথমিকভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে জনমানুষের নিকট প্রবল করে তোলে।

উদাহারণত, ১৯১৭ সালে রাশিয়ান বিপ্লবের প্রাক্কালে জেনারেল কর্নিলভ বলশেভিকদের, বিশেষভাবে লেলিনকে জার্মান চর আখ্যা দিয়ে তার পার্টির উপর ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ন চালায়। যার বিপরীতে বলশেভিকদের অবিচল ও সুদৃঢ় অবস্থান ইতিহাসের মানচিত্র পাল্টে দেয়। অথচ বলশেভিকরা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিকদের চেয়েও ছিল কম জনপ্রিয়। আবার, ৬০ এর দশকে পূর্ব বাংলায় আব্দুস সবুর খান, মাওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ বা নুরুল আমিনদের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতাদের টপকে শেখ মুজিবের মতো নবীন রাজনীতিবিদ অল্প সময়েই বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। এর অন্যতম কারণ তার অবিচলতা ও আত্মত্যাগ। তার দুই যুগের রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেককই কাটে কারাগারে। নিশ্চিত ফাঁসির রায় হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আইয়ুব খানের ডাকে সাড়া না দেয়ার মতো পাহাড়সম দৃঢ়তা, এজাতির মাঝে বিরলই বটে। পরবর্তীতে সিরাজ শিকদারের অন্তঃসারশূন্য আন্দোলনেও জাতির আত্মত্যাগী, শিক্ষিত যুবকদের দলে দলে যোগ দেয়ারও অন্যতম কারণ ছিল রক্ষীবাহিনীর হাতে চরম নিপীড়ন সত্ত্বেও আন্দোলনের পথে টিকে থাকা।

একইভাবে, আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এবং ২০০১ এর পরবর্তী সময়ে বিপ্লবী ঈমানদাররা এত বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে, যার ফলে দূরদূরান্ত থেকেও মুসলিমরা তাদের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ প্রথমবার ও ২০২১ সালে দ্বিতীয়বার তারা বিজয় লাভ করেন। সুতরাং যে শ্রেণীটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে তাদের জন্য এটা আবশ্যক যে, তারা ত্যাগ-তিতিক্ষার একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। যার মাধ্যমে তাদের আদর্শ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। পরিণামে, জনসমর্থন ও আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবের অগ্রবর্তী শ্রেণীটির পক্ষে সম্ভব হবে জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করা। আদর্শের উপর অবিচলতা ও আত্মত্যাগ ব্যাতীত, কেবল বক্তৃতার মঞ্চ, রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ বা মাসলাহাতের দলীলের দ্বারা সফলতা তো দূরে থাক, আন্দোলন জারি রাখাই সম্ভব না। যার আধুনিক উদাহারণ- হেফাজতে ইসলামের সম্ভাবনাময় মহান আন্দোলনের করুণ পরিসমাপ্তি!

আদর্শ, আত্মত্যাগ ও অবিচলতার পাশাপাশি কার্যকর ও ফলদায়ী বিপ্লবী আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল- সমাজে অবস্থিত বিপ্লবের উপযোগী শ্রেণীগুলোকে চিহ্নিত করা, তাদেরকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা। বিগত একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—কৃষক, শ্রমিক, সেনাবাহিনী ও উলামা-তলাবাগণ বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

আমাদের দেশের সিংহভাগ ইসলামী আন্দোলনের মাঝে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা কওমী উলামাদের নের্তৃত্বে এদেশে একটা বিপ্লব গড়ে তুলবে, ফ্রন্ট চালু হবে। দ্বীনের প্রতি আন্তরিকতার কারণেই সম্ভবত তাদের ব্যাপারে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ৪৭ এর পর থেকে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত নির্যাতন-শোষনের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের গণ-আন্দোলনের সাথে এই শ্রেণীটির সরাসরি কোনো ভূমিকা বা সম্পৃক্ততা নেই। যার ফলে তাদেরকে বরাবরই সমাজের ব্রাত্য ও নিস্ক্রিয় শ্রেণীই থেকে যেতে হয়। কারণ ইতিহাস কেবল কীর্তিমানদের স্মরণ রাখে, বিচক্ষণদের না। ব্যক্তিগত ইতিহাস তো ভিন্ন কথা।

বাস্তবতা হল, ৫২, ৬২, ৬৯ বা ৭১ এ জাতির গতিপথ নির্ধারনী পরিস্থিতির কোথাও, পক্ষে-বিপক্ষে এই মহান শ্রেণিটির কোন সক্রিয়তা তো ছিলই না, কোনো পরিকল্পিত কর্মসূচীও তাদের মস্তিষ্কে জায়গা করতে পারেনি। ১৯৭১'র পরও এদেশে বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইসলামবিরোধী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বহু দ্বীন ও দেশবিরোধী কাজ সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু এশ্রেণীটি সেসবের বিরুদ্ধে কখনো কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

২০২১ সালে কুমিল্লায় কুরআন পোড়ানোর নজিরবিহীন ও মর্মান্তিক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া অন্তর বিদীর্ণকারী ঘটনাটি ইতিপূর্বের মতিঝিল, ভোলা আর বি. বাড়িয়ারই ধারাবাহিকতা। সামনে এমন ঘটনা আরো ঘটবে এটাও বলা যায়। কেননা, এটা ইতিমধ্যেই একটা ফেনোমেনা বা প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণের অনবদ্য ভূমিকার ফলে ক্রমান্বয়ে মেরুকরণ তীব্র হচ্ছে।

এছাড়াও, আমরা যদি মার্ক্সবাদীদের অবস্থা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের বিপ্লবে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল সবচেয়ে বেশি। একইসাথে সেনা সদস্যরাও ছিল। তাই আমাদের দেশের একসময়ের মার্ক্সবাদীরাও তাদের বিপ্লবের লাইন হিসেবে গ্রহন করেছে "গণ-অভ্যুত্থান" (সমকালীন সময়ে ফরহাদ মজহারদের মতো অনেকে এখনো এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ও আগ্রহী)।

এজন্য তারা শ্রেণী হিসেবে নির্ধারণ করেছিল "শ্রমিক" শ্রেণীকে। তাই তাদের গণসংগঠনও শ্রমিকদেরকে টার্গেট করে বেশি। কেন? কারণ লেনিনের বিপ্লবে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল এবং তারাই বিপ্লবের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। জারতন্ত্রের পতনের পর ১৯১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে হওয়া বুর্জোয়া বিপ্লবের পর, বিভিন্ন শ্রেণীপেশার লোকদের বুর্জোয়ারা প্রচুর রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো ওই সময় আরও শক্তি সঞ্চয় করে। এমনকি সেনা গ্যারিসনসমূহের অভ্যন্তরে সৈনিকরা রাজনৈতিক চর্চা এবং তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার পায়। এতে করে সৈনিকদের সংগঠিত করা সহজ হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বামপন্থীরা ৭৫ এর পর সেনাবাহিনীতে সেই প্রভাবের ছিটেফোটাও ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আর শ্রমিক ইউনিয়নের কথা তো আগেই বলা হলো।

এ দেশের মার্ক্সবাদীরা অধিকাংশ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিলেও, তাদের সব দল-উপদল নিজেদের লক্ষ্য থেকে ওলামা-তলাবা ও দ্বীনদার মুসলিমদেরকে ছেঁটে ফেলার ব্যাপারে একমত ছিল। তাই তারা এই শ্রেণীটির ওপর শাসক গোষ্ঠীর নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে কখনো কথা বলেনি। অথচ শোষকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন কথিত সংখ্যালঘুদের পক্ষে তারা সব সময় সোচ্চার। এদেশের মার্ক্সবাদীরা ইসলাম ও তার অনুসারীদের বাদ দিয়ে তথাকথিত বিপ্লব করতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়ে তাদের আন্দোলন। তাই মার্ক্সবাদীদের মতো করে ইসলামী বিপ্লবের চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়।

সবশেষে এই উপসংহারে আসতে হয় যে, আবেগপ্রবণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এই ছোট্ট সমতল ভূমিতে সংকট ও সম্ভাবনা উভয়ই বিদ্যমান। যার ফলে ইতিহাস একাধিকবার, দুশ বছরের ঘটনাপ্রবাহ এদেশে দুই দিনে ঘটে যেতে দেখেছে। আর এমন সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, সাহসী ব্যক্তিরাই পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। তবে এজন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা-মানহাজ, সঠিক রাজনৈতিক লাইন এবং উপযোগী ও আদর্শিক নের্তৃত্বের উপর গড়ে ওঠা আপসহীন বিপ্লবী সংগঠন। আর এ লক্ষ্যে যোগ্য অগ্রবর্তী বাহিনী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে, কেবল বিশেষ কোনো শ্রেনীকে অবলম্বন না করে- সমাজের গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী-পেশার পুরুষদের সংগঠিত ও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যারা আদর্শিকভাবে দৃঢ়, আত্মত্যাগে সক্ষম এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। তাদেরকে ইসলামী আকিদা ও মানহাজের আলোকে সংগঠিত করা ব্যাতীত বিচ্ছিন্ন কোনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন সফলের চিন্তা বাতুলতা মাত্র।

এজন্য, আমাদের দায়িত্ব হলো, ইসলামের জন্য অগ্রসর হওয়া জনতাকে বিপ্লবী আন্দোলনে একত্রিত করা। বিশেষত ছাত্র, শ্রমিক,

ব্যাবসায়ী, কর্মকর্তা প্রমুখকে বিপ্লবী আন্দোলনে একত্রিত করা এবং ক্রমাগত তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা দিতে এগিয়ে আসা। কেননা, রাতারাতি একটি আন্দোলন বা সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে জালিমশাহীর প্রতিস্থাপন বা দীর্ঘমেয়াদী পরিশুদ্ধি আন্দোলন ঘটানো সম্ভব না। বরং, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিই পারে জনগণকে প্রস্তুত করে চূড়ান্ত পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে এবং অর্জনকে সংরক্ষণ করতে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হচ্ছে। কিন্তু পরিপূর্ণতার জন্য দরকার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে উঠে আসা, আদর্শের উপর অবিচল, আত্মত্যাগে সক্ষম, সাহসী ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নের্তৃত্ব ও সংগঠন; যারা পরিস্থিতিকে ইসলামের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিবেন!

এখন বাচাল বুদ্ধিজীবী বা দুনিয়ালোভী প্রৌঢ় নয়, প্রয়োজন শুধু জীবনের উপর মৃত্যুকে প্রাধান্য দানকারী নের্তৃত্বশ্রেণী। আল্লাহ তাআলা এই অগ্রবর্তী বাহিনীটিকে প্রস্তুত করে দিন এবং বাকিদের তাদের চেনার ও আনুগত্যের তাওফিক দিন। আমীন।

(২)

পুঁজিবাদ বিকশিত হবার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের আসনে চলে আসে। বৈশ্বিক প্রবণতা বা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে অতোটা প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় নয়।

মোটা দাগে বলা যায়, শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টির রাজনীতির হাত ধরে গত শতাব্দীর ৪০ দশক থেকেই পূর্ব বাংলার রাজনীতির নের্তৃত্ব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। শেরে বাংলার KSP, ভাসানী-মুজিবের আওয়ামী লীগ এবং পরবর্তীতে বিএনপি-জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। গণমানুষের দল হয়ে ওঠা বা পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত, সাহসী (ভালো-মন্দ বা ঠিক-বেঠিক আলোচনা করছি না) নের্তৃত্ব তৈরীতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটিই বরাবর motive force হিসেবে কাজ করেছে।

আমরা দেখেছি সমাজের এলিট, ব্যবসায়ী বা আমলা শ্রেণী কিংবা সামরিক শ্রেণী যখনই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছে অর্থ বা ক্ষমতার জোরে, তখনই ব্যর্থ হয়েছে। এরশাদ বা ১/১১ এর সরকারের ক্ষেত্রেও আমরা তা দেখেছি।

ব্যবসায়ীদের হাতে রাজনীতির ভার দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগের মতো দলের রাজনীতিই ধ্বংস হয়ে গেছে। জাতীয় পার্টিতে নাজিউর রহমান, কাজী জাফরের মত নেতারা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি থাকায় কিছুটা হলেও অস্তিত্ব টিকেছিল। বাকি বিএনপি'র নেতা সামরিক বাহিনী থেকে আসলেও জেনারেল জিয়াউর রহমান, মীর শওকত আলী ও অলি আহমেদরা ১৯৭১ এর তীব্র জনযুদ্ধে জনতার কাতারে নেমে এসেছিল। এছাড়াও বিএনপির রাজনৈতিক দল হিসেবে বিকশিত হবার পথে মশিউর রহমান জাদু মিয়া, আতাউর রহমান খান, শাহ আজিজদের মত ঝানু রাজনীতিবিদদের (যারা শেখ মুজিবের আমলে নিগৃহীত হয়) প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। বলাই বাহুল্য এরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা। পরবর্তীতে, মান্নান ভূঁইয়া, খন্দকার দেলোয়ার, মির্জা ফখরুল বা রুহুল কবীর রিজভীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিএনপি নেতারাও একই শ্রেণী থেকে উঠে আসা।

এছাড়াও, একসময় কমিউনিস্ট রাজনীতির ব্যাপক জোয়ার এদেশে ছিল। জাসদ, সর্বহারা পার্টি বা সিপিবি – যে দলেরই নেতৃত্বের দিকে তাকান, সেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই দেখা পাবেন। উল্লেখ্য, যে বা যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা কেন্দ্রের নিকটে গেছে বা viable সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে কেবল তাদের কথাই আলোচনা করা হচ্ছে। লক্ষ্য করুন, লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি, সর্দ্দা সহায়ক ভূমিকায় থাকা বা হর্স ট্রেডিংয়ের উপযুক্ত গোষ্ঠী আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

সুবিধাবাদী, সংশোধনবাদী কিংবা লুম্পেন বুর্জোয়াদের জন্য যৎকিঞ্চিত আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা ও অতিরঞ্জিত আবেগ

ব্যবহারের দক্ষতাই সাধারণত লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির ফসল ঘরে তোলার জন্য যথেষ্ট। এটাকে নের্তৃত্ব বলা চলে না। তাই তরিকত ফেডারেশন, বাসদ, সাম্যবাদী দল, জামাত ইত্যাদি দলের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

বাকি, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতির নেতৃত্বে সবসময়ই দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম ছিলেন, আছেন। আহলে হাদীসদের উলামা-দাঈদেরও প্রেশার গ্রুপ হিসেবে একটা অবস্থান রয়েছে। কওমী ঘরানার রাজনৈতিক আন্দোলন শেষ অবধি প্রেশার গ্রুপ হিসেবে কার্যকর থাকা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। সর্বব্যাপী ফাসাদ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে, সামাজিক পর্যায়ে ইসলামকে ধরে রাখতে দেওবন্দী-আহলে হাদীস উভয় ঘরানার দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা উনাদের কবুল করুন।

কিন্তু ইসলামের সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য উপযুক্ত ন্যারেটিভ/ বয়ান নির্মাণে, আত্মত্যাগী ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ধারণে, ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত কর্মসূচির সফল রূপান্তরে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেননি; এটা নিরাপত্তার সাথেই বলা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? সহজ উত্তর হচ্ছে – বাংলাদেশে রাজনীতি ও ক্ষমতার ডাইনামিক্স শেখা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব। '৪০ দশকের পর এই প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। পুঁজিবাদের বিকাশ ও শিক্ষা (techne, not knowledge) অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম হওয়া - নানা কারণে এটি হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণের চেষ্টা অন্যত্র, অন্যসময় করা যাবে।

শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সূত্রমতে ২০১৯ সালে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে উন্মোচিত হয়েছে যে – মাদ্রাসার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৬%। আর জেনারেল শিক্ষিত ৯৪%![1]- মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা অনিবার্য কারণেই এমন যে – জীবনের ব্যক্তিত্ব গঠনের বয়স পর্যন্ত সমাজ থেকে কিছুটা দূরেই তাদের থাকতে হয়। এছাড়াও, কয়েক শতকব্যাপী মাদ্রাসাগুলো ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থা প্রতিহত করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই হিমশিম খেয়েছে। তাই একদিকে জনসংখ্যার মাত্র ৬% (প্রকৃত হিসাবে আরো কম হবে যেহেতু জনগোষ্ঠীর সবাই ছাত্র না। এবং ছাত্র বা শিক্ষক না,এমন ব্যক্তিরা সাধারণত দেওবন্দী বা আহলে হাদীসদের রাজনীতির আওতাভুক্ত হয় না।), তার উপর অতিরঞ্জনশীল মনোভাব। যার ফলে বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা, সমাজের dominant/ আধিপত্য বিস্তারকারী নানা শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব, ভাষা, আচরণের পরম্পরা, শংকা ও উদ্বেগের ব্যাপারে তাদের বোধ কমই থাকে। বিশেষ ব্যতিক্রম অবশ্যই থাকে, যেমন শায়খ হারুন ইজহার।

বিপরীতে, সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত অংশের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত দাদা / বাবার নাতি বা সন্তান। এবং স্কুল কলেজের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখা একজন ছাত্রের উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তের ব্যাপারে শুধু পরিচিতিই (সখ্যতা যদি নাও হয়) লাভ হয়, তা ই নয়। বরং, দেশের বিভিন্ন অংশের, বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্যময় মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এছাড়াও নানা কারণ রয়েছে যেসব কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজ, রাজনীতি ও ক্ষমতার ভাষা, প্রকৃতি ও সংকট সম্পর্কে বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই সাধারণ সচেতনতা অর্জন করে থাকে, অনেকটা অবচেতনভাবেই। আর যারা সচেতন হতে চায়, দেখা যায় যে তাদের মধ্যকার খুব কমই রাজনৈতিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক থেকে যায়।

সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ইসলামপন্থীদের নের্তৃত্ব দিতে হলে তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই এগিয়ে আসতে হতো, হবে। এক্ষেত্রে দেওবন্দী ও আহলে হাদীস উভয় ঘরানার দাঈ-উলামাদের ইলম, ফতোয়া, দিকনির্দেশনাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। হাসিনা ও আওয়ামী লীগের পতনের পর, বাংলাদেশে আমার জানামতে প্রথমবারের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা ভাইয়েরা ইসলাম ও মুসলিমদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছেন, উঠতে যাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়া ৫ই মে'র পর শুরু হয়। অতঃপর, দীর্ঘ তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে আজকের এই অবস্থায় পৌঁছেছে।

আশা ও সম্ভবনা তাই অনেক। সংকট ও প্রতিকূলতাও কম নয় (পরবর্তীতে এব্যাপারে কথা হবে)। ইসলাম ও বিপ্লবের সমূহ

সম্ভাবনা এখন আর বিমূর্ত নয়। আমাদের এই সম্ভাবনাময় ভাইদের সাথে উলামা-দাঈ ও আপামর জনসাধারণের সবাইকে সাহায্য-পরামর্শ, সমালোচনা ও সক্রিয়তার মাধ্যমে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবার আহবান জানাচ্ছি। তাদেরকে অন্তত জায়গা দিন। কেননা, ফা লিল্লাহিল হামদ, এক অভূতপূর্ব বাস্তবতা উপস্থিত।

1 ৭ই নভেম্বর ২০১৯, প্রথম আলো। "দারিদ্র্যের অর্থনীতি", রেখাচিত্র ৮.১, পৃষ্ঠা ২২১